বাংলার ডাকাত

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

পুনশ্চ

দু-একটি কথা

আমাদের বাঙলা-সাহিত্যের এক অংশ কীশোর-সাহিত্য। অংশটি নানাজনের দানে সুসমৃদ্ধ এবং এর গতি আজও রুদ্ধ হয়নি। এই অংশটির সঙ্গে আমি সুদীর্ঘকাল থেকে যুক্ত। অভিজ্ঞতার ফলে বলতে পারি, গল্প-উপন্যাস, বিশেষ করে, সেগুলি যদি অ্যাড্‌ভেনচার-ধর্মী, ভৌতিক, গোয়েন্দা বা দুর্ধর্ষ দস্যুর হয় তাহলে কীশোর পাঠক সমাজে অত্যন্ত প্রিয় হয়ে থাকে। এই গ্রন্থে সেকালের 'বাংলার ডাকাত' সম্বন্ধীয় মৎ-রচিত কতকগুলি রচনা সন্নিবেশিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে রয়েছে দুখানি উপন্যাস ও পাঁচটি ছোটো গল্প। উপন্যাস দুখানি, 'বাগদি ডাকাত' ও 'কালো পাঞ্জা' এবং একটি গল্প 'ডাকাতের ডুলি' বহুদিন পূর্বেই কীশোর-পাঠক-সমাজে সমাদৃত হয়ে হাজার হাজার কপি বই বিক্রি হয়েছে। কীন্তু রচনা কয়টির ঘটনা ও চরিত্রগুলি আমার স্ব-কপোলকল্পিত। অবশিষ্ট চারটি গল্প আমি বাল্যে শুনেছি। পরবর্তীকালে 'রঘু ডাকাতের' কাহিনিটি ছাড়া অবশিষ্ট তিনটির কথা ইংরেজ সরকারের প্রতিবেদনে পাঠ করেছি। সুতরাং বাস্তবভিত্তিক। কীশোর পাঠক-সমাজে গ্রন্থখানি সমাদৃত হলে শ্রম সার্থক মনে করব।

২৫শে বৈশাখ, ১৩৮৪
৫৯, দেবীনিবাস রোড
কলিকাতা-৭৪

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

নতুন সংস্করণের সংযোজন

বর্তমান সংস্করণে 'শশী' লাঠিয়াল' ও 'লাঠির গুণে'—এই সমধর্মী গল্প দুটি সংযোজিত করে লেখকের ডাকাত-বিষয়ক উপন্যাস ও গল্প-সংগ্রহের পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া হল; সেইসঙ্গে লেখকের ইচ্ছার প্রতি মর্যাদাও দেখানো হল।

গ্রন্থমেলা, ১৯৯২

প্রকাশক

সূচিপত্র

বাগ্‌দি ডাকাত (উপন্যাস)	৯
বিশে ডাকাত (গল্প)	১১৮
মনোহর ডাকাতের গল্প	১৩৯
ডাকাতের ডুলি (গল্প)	১৪৫
বিশে ডাকাতের আরও গল্প	১৫৩
রোঘো ডাকাত (গল্প)	১৫৯
কালো পাঞ্জা (উপন্যাস)	১৬৪
শশী লাঠিয়াল (গল্প)	২৫০
লাঠির গুণে (গল্প)	২৫৭

বাগ্‌দি ডাকাত

॥ বনপথে ॥

নবাব আলিবর্দি খাঁ তখন বাংলা-বিহার-ওড়িশার শাসনকর্তা। মাঝে মাঝে গ্রামবাংলা বর্গি লুঠেরাদের হঠাৎ হামলায় দারুণ উৎপীড়িত হচ্ছে। সেই সময়ে একদিন দ্বিপ্রহরে দক্ষিণ বাংলার এক অংশে ষোলো বেহারার কাঁধে একখানি পালকি বনপথে বেশ তাড়াতাড়ি চলেছে। বেহারারা উঁচু সুরে আওয়াজ করছে, 'হুম হুম হো হো, হুম হুম হো হো।' সে সুর উত্তরে বাতাসে গাছপালার গায়ে ধাক্কা দিতে দিতে বনের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে।

শীতকাল। সে কারণ বনটি শীর্ণ ও প্রায় পাতাশূন্য, পাখির কণ্ঠেও ডাক নেই। কেবল বন-ঝিঁঝি ও বন-ঘুনের বিরামহীন ঝিমিঝিমি বনের নির্জনতা বাড়িয়ে গভীর রাতের শূন্যতাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে।

যে পথ ধরে বেহারারা চলছিল সে পথে সচরাচর পথিকের আনাগোনা ছিল না। পথটি কাঠুরে, মউলি বা মধুসংগ্রাহকদের পায়ে পায়ে একটি রেখার মতো গড়ে উঠেছে। তার দু'পাশে মস্ত মস্ত গাছ থাকায় দিনমানেও কিছুটা অন্ধকার। সেজন্য একা বা কয়েকজন মিলে চলতেও ভয় করে। শীতকাল বলে গাছগুলির গোড়ায় রাশি রাশি শুকনো পাতা। এবং তা দিন-রাত টুপটাপ ঝরে পড়ছে। তার ওপর দিয়ে মাঝে মাঝে কাঠবেড়ালি বা গিরগিটি হঠাৎ ছুটে গাছে ওঠার সময় এমন একটু শব্দ উঠছে যে মনে হচ্ছে, কোনো অজগরের আচমকা নিঃশ্বাস।

বনটি ভয়ংকর হলেও যারা তখন সেটি পার হচ্ছিল, তারা নির্ভয়। একে তারা সংখ্যায় ত্রিশজন, তার ওপর সকলেই বলিষ্ঠ ও সশস্ত্র—পিঠে তির-ধনুক, হাতে বর্শা, কোমরে তলোয়ার।

পালকির দু'পাশের দরজা খোলা। আরোহী কোমল মখমলের বিছানায় সোনালি জরিদার মখমলের তাকিয়ায় হেলান দিয়ে গড়গড়া টানতে

টানতে দু'পাশের পথের দৃশ্য যতটুকু দেখা যায় ততটুকু দেখতে দেখতে চলেছেন।

ওদিকে বেলাও পড়ে আসছে। আবছা অন্ধকারে বনভূমির দৃশ্য ক্রমে কালো হচ্ছে। বেহারারা চেষ্টা করছে সূর্য ডোবার আগেই বন থেকে বেরিয়ে পড়তে। কারণ, বনের অন্ধকার দস্যু-তস্কর ও পথিকের অসুবিধা ঘটালেও হিংস্র জন্তু, বিশেষ করে বাঘের শিকার ধরার সুবিধা করে দেবে। সে অঞ্চলে দিনে-রাতে মানুষের এই দুই শত্রুর উৎপাতের খবর আশ-পাশের গাঁ-গঞ্জের লোকের জানা ছিল। যারা তখন সেখান দিয়ে যাচ্ছিল তারা তো জানতই।

অরোহী হঠাৎ বললেন, "এই! পালকি থামা।" বলেই উঠে বসলেন।

বেহারারা চলার বেগ সামলাতে সামলাতে খানিক এগিয়ে গেল।

আরোহী আবার বললেন, "পালকি থামা।"

বেহারারা কলের পুতুলের মতো পালকি ঘাড়ে নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে সমুখ-পিছন থেকে রক্ষীদের দুই সর্দার ছুটে এসে পালকির দু'পাশের দরজায় দাঁড়াল।

আরোহী বললেন, "এই বনেই শিকরে বাজের আড্ডা নয়?"

তাদের একজন বললে—"মহারাজ, সে কোথায় থাকে তা জানিনে, তবে এদিকেও তার গতিবিধি আছে—"

—"তোরা কতজন আছিস্?"

—"বেহারাদের নিয়ে ত্রিশজন।"

—"পালকি নামাতে বল্।"

লোকটা 'মহারাজের' আদেশ বেহারাদের জানাতেই তারা তৎক্ষণাৎ পালকি নামাল। তাদের সঙ্গে পাইক-বরকন্দাজরাও থামল। কিন্তু এই গহন বনে, হঠাৎ পালকি থামে কেন, তারা কেউ বুঝতে পারে না।

অমনি বরকন্দাজদের সর্দার গাল-পাট্টাওয়ালা একটি লোকও তাড়াতাড়ি পালকির দরজায় ছুটে এসে নমস্কার করে বললে—"মহারাজ কী হুকুম? জায়গাটা ভালো নয়।"

তারপরই তার ইঙ্গিতমাত্র সকলে পালকির দিকে পিছন ফিরে পালকিখানাকে ঘিরে দাঁড়াল। পালকির ভেতর যিনি ছিলেন, তিনি ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন—"আমি কয়েদি, না স্ত্রীলোক—যে, আমাকে আগলে দাঁড়ালি?"

সেই গাল-পাট্টাওয়ালা লোকটা বিনীত কণ্ঠে কেবলমাত্র বললে—"মহারাজ!"

বেহারারা পালকির কাছে দাঁড়িয়ে গায়ের ঘাম মুছছিল। তারা হাতখানেক দূরে সরে গেল। পালকির আরোহী তাঁর তলোয়ারখানা কোমরে বাঁধতে বাঁধতে সেই গাল-পাট্টাওয়ালা লোকটাকে বললেন—'জিৎরাজ, তুই শিকরে বাজকে কখনও দেখেছিস?"

—"না, মহারাজ!"

—"তবে তাকে এত ভয় করিস কেন?"

—"মহারাজের আশীর্বাদে আমি কাউকেই ভয় করিনে—" বলে জিৎরাজ বুকের ছাতি ফুলিয়ে দাঁড়াল ; তারপর আবার বললে—"মহারাজের কী আজ্ঞা হয়?"

—"এখান থেকে রায়গড় কত দূর?"

—"এক বেলার পথ।"

—"ডানধারে একটা শুঁড়িপথ দেখা যাচ্ছে না?"

—"হ্যাঁ, পথের মতোই লাগছে—"

—"ওটা দিয়ে কি মানুষ চলে?"

—"মহারাজ, ঠিক করে বলা যায় না ; জন্তু-জানোয়ারের চলবার রাস্তাও হতে পারে।"

—"এ জঙ্গলের পথ তোরা চিনিস্ না?"

—"অল্প-স্বল্প জানি—"

—"তবে যদি শিকরে বাজ তোদের ওপর ছোঁ মারে, পালাবি কী করে?"

—"মহারাজ, পালাব কেন? সে যদি আসে তার ডানা দুখানা এমন ভেঙে দেব যে আর কোনোদিন উড়তে পারবে না?"

আরোহী পালকি থেকে বেরিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি দীর্ঘাকার, গৌরবর্ণ ও বলিষ্ঠ পুরুষ। তাঁর গায়ে জরিদার পোশাক, মাথায় জরিদার পাগড়ি, পায়ে মখমলের ওপর জরি-দেওয়া নাগরাই। তাঁর মুখে-চোখে বীরত্ব ও ক্রুরতা ফুটে আছে। তিনি তলোয়ারের কারুকার্য করা হাতলটা বাঁ-হাতে ধরে, ডান হাতের দু'আঙ্গুল দিয়ে গোঁফ চোম্‌রাতে চোম্‌রাতে গম্ভীরমুখে একবার চারধারে তাকিয়ে দেখলেন।

চারধারে পাতাহীন স্তব্ধ শীর্ণ বন। শীতের বাতাস হু-হু করে তার মধ্যে দিয়ে ব'য়ে যাচ্ছে। দু-একটি পাখি ডাকছে, দুটি-চারটি শুকনো পাতা খসে

পড়ছে। একটি হাত-দুই চওড়া পথ গাছের তলা দিয়ে একদিকে চলে গেছে। কিন্তু তার বেশিদূর দেখা যায় না—কিছুদূর গিয়েই ঘুরে গাছের আড়ালে ঢাকা পড়েছে। পথটার অবস্থা দেখে মনে হয় না যে, তার ওপর সচরাচর লোক চলাচল করে।

আরোহী পালকির দিকে ফিরে ডাকলেন—"জিৎরাজ!"

—"মহারাজ!"

—"সে-বার পাইকদের সঙ্গে শিকরে বাজটার লড়াই হয়েছিল কোথায়?"

—"মহারাজ! সেকথা আমার জানা নেই, বাঘা জানে। এই বাঘা—"

বাঘা আরোহীর দিকে ফিরে দাঁড়াতে জিৎরাজ জিজ্ঞাসা করলে—"সেবার শিকরে বাজ পড়েছিল কোথায় রে?"

বাঘা বর্শা দিয়ে সামনের দিকটা দেখিয়ে ভাঙা গলায় বললে—"এর কাছ বরাবর—"

আরোহী জিজ্ঞাসা করলেন—"তাকে তুই দেখেছিস?"

—"হ্যাঁ মহারাজ! তারই সঙ্গে আমার লাঠির টক্কর হয়েছিল।"

—"তাকে যদি এখনই দেখিস্ চিনতে পারবি?"

বাঘা সচকিত হয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললে—"হ্যাঁ হুজুর! যদি সে ভোল না বদলায়—"

আরোহী একবার ঠোঁট কামড়ালেন ; তারপর নিজের মনেই বললেন—"মহাদেব রায়ের খাজনা লুঠ।"

তারপর আর তিনি দাঁড়ালেন না, পালকিতে উঠে বসলেন। বেহারারা পালকি কাঁধে তুলে নিলে। এমন সময় হঠাৎ একটা চাপা শিস্ শোনা গেল ও সেই সঙ্গে শব্দ হল—ঠক্।

পালকির বেহারারা ও জিৎরাজ সচকিত হয়ে উঠল। আরোহী বললেন—"জিৎরাজ! দেখ্ তো পালকির মাথায় কি যেন একটা পড়ল।"

জিৎরাজের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাঁর কথা বলবার আগেই শব্দের কারণ খুঁজে বার করেছিল। সে দেখলে, পালকির চালের ওপর একটা তির গেঁথে গিয়ে তখনও থর্-থর্ করে কাঁপছে।

সে ছুটে গিয়ে সেটা জোরে টেনে নিয়ে আরোহী অর্থাৎ মহাদেব রায়ের হাতের দিলে।

মহাদেব রায় দেখলেন, তার গলায় এক টুকরো তুলোট কাগজ সুতো দিয়ে বাঁধা। তিনি খুব কৌতূহল বোধ করতে লাগলেন ; তাড়াতাড়ি কাগজখানা খুলে দেখেন, তাতে লেখা—

"মহাদেব রায়, আর এক পক্ষ সময় দিলাম কুমারদের ছেড়ে দাও। না হলে তোমার জন্যে একটি তির তোলা রইল। —শ্রীবাজপাখি।"

মহাদেব রায় কাগজের টুকরোটুকু আরও একবার পড়ে, ঠোঁট কামড়ে নিজের মনে বলে উঠলেন—"আচ্ছা, দেখা যাক—"

তারপর তিরটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা করে বললেন—"জিৎরাজ! হুঁশিয়ার। পা চালিয়ে চল্।"

জিৎরাজকে সাবধান করবার দরকার ছিল না : সকলেই ইতিমধ্যে সতর্ক হয়ে উঠেছিল। তাদের মনে হতে লাগল, বাজপাখিটা তাদের চারধারেই ঘুরপাক দিচ্ছে; অতর্কিতে এসে ছোঁ দেবে। তৎক্ষণাৎ পালকি ছুটল।

কিন্তু বেশিদূর যেতে হল না ; ক্রোশ দুই যাবার পরই দেখা গেল রায়গড় থেকে তিনজন ঘোড়সওয়ার ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে আসছে। তারা এসে সোজা মহাদেব রায়ের কাছে গেল। তারপর তাদের একজন তাঁর কানে কানে কী যেন বলতেই রায় মহাশয় তিরটা কোমরে গুঁজে পালকি থেকে বেরিয়ে তিনটি ঘোড়ার মধ্যে যেটি সবচেয়ে তেজী ও দেখতে সুন্দর, সেই ঘোড়াটির পিঠে উঠে তৎক্ষণাৎ ঊর্ধ্বশ্বাসে রওনা হলেন। তাঁর সঙ্গে রইল মাত্র দু'জন ঘোড়সওয়ার অনুচর।

জিৎরাজরা অবাক!